শুক্রবার, ৬ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১১৫

হায়দরাবাদে এক পুরোহিতের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত

দেশের বিভিন্ন অংশ যখন দলিত নিপীড়ন এবং দলিত আন্দোলনে আলোড়িত, সে সময়ে হায়দরাবাদে এক নয়া নজির স্থাপন করলেন এক মন্দিরের পুরোহিত। দলিত ভক্তকে কাঁধে চড়িয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে গেলেন স্বয়ং এক পুরোহিত। এভাবেই হায়দরাবাদের মন্দির থেকে এক অভূর্তপূর্ব সাম্যের বার্তা দেওয়া হল জাত-পাতে দীর্ণ সমাজকে। বেশ কিছুদিন যাবৎ দলিত রমণীকে নাজেহাল, দলিত ছাত্রদের এক ঘরে করার নানা চক্রান্ত চলছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিকে সামনে রেখে এই বজ্জাতি চলছে। কখনও কখনও ভোটের জন্য দলিতদের বাড়ির দাওয়ায় পাত পেড়ে খাওয়ার মতো চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চবর্ণের লোকজন জাত-পাতকে হাতিয়ার করে দলিতদের নিগ্রহ করছে। স্বাধীনতা লাভের ৭০ বছর পর এমন ঘটনা লজ্জার। এটা ভাবা যায় না। দলিতরা দলিত বলে পরিচিত হয়েছেন একদল মানুষের বিচারে। দলিতরাও ভারতবাসী। এটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। পিছিয়ে পড়া মানুষদের বহুদিন যাবৎ মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থে তাদের অচ্ছুৎ করে রেখেছে, এর চেয়ে বড় সামাজিক অপরাধ আর কী হতে পারে? এরই মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ঘটল হায়দরাবাদের ওই মন্দিরে। চিলকুর বালাজি মন্দিরের অর্চকা সিএস রঙ্গরাজন দলিত সম্প্রদায়ের আদিত্য পাসিকে গলায় মালা দিয়ে কাঁধে চড়িয়ে সাদর আপ্যায়নের মাধ্যমে নিয়ে গেলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। সঙ্গে চলে সঙ্গীত ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। এরচেয়ে বড় কাজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

‘‘আমি একটি তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুখে পুঁতেছিলাম; মরে গেল। পাঁঠা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না।’’

‘‘গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। ‘এ ঐ!’ ব্যাখ্যা করত— এ শিষ্য! ঐ তোমার ইষ্ট! আবার রাবণের দশমুণ্ড বলতো, দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।’’

[রাম, তারক ও নিত্যগোপাল]

ঠাকুর মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, তারক (শিবানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা মেঝেতে বসিলেন। মাষ্টারও মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাম বলিতেছেন, ‘‘আমরা খোল বাজনা শিখিতেছি।’’

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)— নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে?

রাম—না, অমনি একটু সামান্য বাজাতে পারে।

দিনপঞ্জিকা

৬বৈশাখ, ভাঃ ৩০চৈত্র, **২০ এপ্রিল,** ৬ বহাগ , সংবৎ ৫ বৈশাখ সুদি, ৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬। **শুক্রবার,** পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১১।০ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩০ মিঃ। শোভনযোগ দিবা ঘ ১।২৫ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ১২।০ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১১।০ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১২।১৪ গতে মিথুন রাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ঘ ১১।৩০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**— দোষ নাই। **যোগিনী**— দক্ষিণে, রাত্রি ঘ ১১।০ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।২৭ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৪৬ গতে ১০।১১ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ১।২৫ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৩।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭২৪ গতে দক্ষিণে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১১।০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১।২৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ **মুখ্যান্নপ্রাশন** গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দিবা ঘ ১।২৫ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ৩।৪৯ গতে দেবতাগঠন নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপন্নারাম্ভ পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ভূমি ক্রয়বিক্রয় গোবিক্রয়াদি কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেদ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। **বিবাহ—সন্ধ্য ঘ ৫।৫৬ গতে রাত্রি ঘ ৭।৪২ মধ্যে তুলা লগ্নে সূতহিবুকযোগে বিবাহ/বিবিধ**— পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১১।০ গতে মাসদগ্ধা। ষট্পঞ্চমীর ব্রত। হাওড়া রামরাজাতলায় সাবিত্রীপিঠস্থ শঙ্কর মঠে ও **হরিদ্বারস্থ** শ্রীশ্রীভোলাননগ সন্ন্যাসাশ্রমে জগদ্গুরু **শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্যদেবের জন্মতিথি ও পূজা** এবং তদুপলক্ষ্যে আগামী রবিবার মহোৎসব এবং **তারকেশ্বরধামে** দিবসত্রয়ব্যাপী পূজা, হোম ও সংকীর্তন। **ভবানীপুর** বাসুদেব যোগশ্রমে **জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যদেবের** আবির্ভাবতিথি ও উৎসব। **কলকাতা সারস্বত সমাজের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যদেবের জন্মোৎসব**। **কলকাতাস্থিত বাগবাজার** গঙ্গানদীর তীরস্থ ভাগবত সভায় **গঙ্গমাতার ও শ্রীশ্রীপঞ্চতত্বের পূজা** ও অপরাহ্ণে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। **জাতীয় জনযোগ দিবস** (২০শে এপ্রিল)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।৪৮ মধ্যে ও ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২ ।৫২ গতে ২।৩৪ মধ্যে ও ৪।১৮ গতে ৫।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩০ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৬বৈশাখ, ভাঃ ৩০ চৈত্র, ২০ এপ্রিল, ৩শাবান, ৬ বহাগ। উঃ ৫।১৬, অঃ ৫।৫৪। শুক্রবার, পঞ্চমী রাঃ ঘঃ ১০।৫৯, সেহ্‌রী শেষ ৩।৪৯, ইফ্‌তার ৬।০৩।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

নগদ সনদ নিয়ে আর গড়িমসি নয়

মীনা নায়ার
শেষ পর্ব

DARPG-এর ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, ২০১৩-র ২৩ ডিসেম্বর অবধি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের দ্বারা ১৪৪-টি নাগরিক সনদ প্রণীত হয়েছে। এই সংখ্যা অবশ্য হ্রাস পাবে; কারণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আওতায় আনা হয়েছে সব ক'টি পৃথকভাবে পরিচালিত স্টেট ব্যাঙ্ককে। আগে হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানীর ও জয়পুর, মহীশূর, পাতিয়ালা বলে পরিচিত স্টেট ব্যাঙ্কগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাগরিক সনদ ছিল। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০১১-র ২৪ জানুয়ারি অবধি ২৪-টি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার উদ্যোগে ৭২৯-টি নাগরিক সনদ প্রণীত হয়েছে। এইসব ওয়েবপেজের হালনগদ করার তারিখ লক্ষ্য করলে এক হাতাশাব্যঞ্জক ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাগরিক সনদের বিষয়টি যেন তার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এবার প্রশ্ন হল, নাগরিক সনদের প্রতিশ্রুতি রূপায়িত করাটা কি এতই দুরূহ কাজ? তাই যদি হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অবশিষ্ট দফতরগুলিকে ওই কাজে উজ্জীবিত করতে কী কী করা দরকার?

নাগরিক সনদের পন্থা-পদ্ধতি

নাগরিক সনদ প্রয়াসের সূচনায় DARPG-এর উদ্যোগে এই সনদ বিষয়ে যে গাইডবুকটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেটিকে একটি সুসংবদ্ধ দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি কার্যকর ও রূপায়ণযোগ্য নাগরিক সনদ সৃষ্টির জন্য কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত, সেসম্পর্কে ওই গাইডবুকে বিশদ নির্দেশাবলী রয়েছে। প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (১) টাস্কফোর্স গঠন; (২) সংগঠন যেসব পরিষেবা দেবে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের চিহ্নিতকরণ; (৩) ক্রেতা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ, কর্মীবর্গ ও তাদের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী সমিতিগুলির সঙ্গে পরামর্শ; (৪) খসড়া সনদ রচনা (মন্তব্য ও সুপারিশের জন্য সেটির প্রচার এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে সনদ সংশোধন); (৫) কোরগ্রুপ বা মূল গোষ্ঠীর দ্বারা সনদটি বিবেচনা ; (৬) মূল গোষ্ঠীর প্রস্তাব বা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মন্ত্রক বা দপ্তর কর্তৃক সনদ সংশোদন; (৭) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ; (৮) সনদের একটি কপি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগে পেশ; (৯) সনদটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ এবং সেটিকে ওয়েবসাইটে তোলা; (১০) জন প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সনদের কপি পাঠানো; (১১) সনদটির কার্যকর রূপায়ণে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রক্রিয়াটি একেবারে নিচের স্তর থেকে শুরু হয়ে বিভাগীয় সকল কর্মীকে, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে নাগরিকদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, তাদের সকলকে জড়িত করেছে। এছাড়াও গাইড বুকটিতে আদর্শ নির্দেশিকা, সাধারণ কাঠামোগত নির্দেশাবলী, কী কী করা দরকার বা দরকার নয় এবং একটি অনুকরণীয় ফরম্যাট বা বিন্যাসের উল্লেখ রয়েছে। গাইড বুকে বিভিন্ন রাজ্যে অনুসৃত সেরা পদ্ধতির উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে; যা কিনা অন্যান্য দফতরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

DARPG প্রকাশিত অন্য এক প্রামাণ্য দলিলে ওই গাইড বুকের এক হালনগদ সংস্করণ পাওয়া যাবে। ২০১০-এ প্রকাশিত ওই দলিলের নামকরণ করা হয়েছে ‘‘কর্মী অভিযোগ-সহ জন অভিযোগের প্রতিকার, নাগরিক সনদ এবং ভারত সরকারের

তথ্য-সহায়ক কাউন্টার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে ‘‘অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রণালীগত সংস্কারের’’ দিকটি। সেইসঙ্গে প্রবর্তিত কেন্দ্রীভূত জন অভিযোগ নিষ্পতি ও নজরদারি ব্যবস্থা বা Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System বা CPGRAMS এবং ‘সেবোত্তম ফ্রেমওয়ার্ক’। শেষোক্ত ফ্রেমওয়ার্কে নাগরিক সনদগুলি ছাড়াও স্থান পেয়েছে জন অভিযোগ ও জন পরিষেবা সরবরাহ ক্ষমতা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব প্রয়াসের দ্বারা জন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে DARPG কর্তৃপক্ষ ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন কাজের মূল্যায়ণ হয়েছে।

নাগরিক সনদের মূল্যায়ন ও আগামী দিনের কাজ

নয়াদিল্লিস্থ ক্রেতা সমন্বয় পর্ষদের সহযোগিতায় DARPG-এর উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে নাগরিক সনদ কর্মসূচিটির মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তী ধাপে সনদের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট মানের মডেল অনুসরণকল্পে ২০০২-’০৩ সালে একটি পেশাদারি সংস্থাকে নিযুক্ত করা হয়। কর্ণাটক সরকারের আটটি গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী দপ্তর দ্বারা যেসব নাগরিক সনদ রচিত হয়েছিল, Public Affairs Centre (PAC) এর সাহায্য নিয়ে সেগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন করা হয়। সমীক্ষায় সনদগুলির যাবতীয় বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। সনদগুলির যে সব অংশকে বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তুর সার্থকতা যাচাই করা হয় সেগুলি হল : দপ্তরটি সম্পর্কে মৌলিক তথ্য, পরিষেবার মান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিক-বান্ধবতার মাপকাঠি। Transparency International এর ভারতীয় শাখা দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দু'টি দপ্তরের দশটি নাগরিক সনদ খতিয়ে দেখেছিল। গুজরাটের বিভিন্ন নাগরিক সনদ জাতীয় উৎপাদশীলতা পর্ষদ বা National Productivity -এর দ্বারা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সনদগুলির কার্যকারিতা যাচাই করে উপভোক্তা ও কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সেগুলির সম্ভাব্য মানোন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করা। এছাড়া পূর্বোক্ত PAC -র উদ্যোগে ২০০৭ সালে দশটি মাপকাঠি অবলম্বন করে বিভিন্ন নাগরিক সনদ নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়। মাপকাঠিগুলি হল : (১) সংশ্লিষ্ট দফতর/এজেন্সির ভিসন/মিশন/লক্ষ্য কী? (২) যেসব বাণিজ্য সম্পন্ন হয়েছে বা সাধারণ পরিষেবা পৌঁছানো হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য, (৩) গুরুত্বপূর্ণ পদের আধিকারিকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, (৪) কী প্রক্রিয়ায় পরিষেবা অধিগত হয়ে থাকে তার বিবরণ, (৫) পরিষেবা জোগানোর খরচ সম্পর্কিত তথ্য, (৬) পরিষেবার গুণমান (সময়সীমা ইত্যাদি), (৭) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, (৮) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, (৯) নাগরিকদের কর্তব্য, (১০) সহজ ও উপভোক্তা-বান্ধব ভাষা এবং এমন একটি ডেটা বা তথ্য সংকলন যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে সারা দেশের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের এবং বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এই ধরনের বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে কয়েকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অধিকাংশ নাগরিক সনদের অসম্পূর্ণতা। পরিষেবা গ্রহণের জন্য আবেদনবিধি, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নাম বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিবরণ হয় একেবারে দেওয়া হয়নি অথবা আংশিকভাবে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, বিভাগীয় নাগরিক সনদের খসড়া তৈরির কাজে অধিকাংশ কর্মীকেই জড়িত করা হয়নি।

উল্লিখিত সমীক্ষাগুলির ভিত্তিতে আগামী দিনে কী কী করণীয়? এজন্য একটি দ্বিমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করে প্রতিটি সরকারি দফতরেই যাতে একটি নাগরিক সনদ থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কর্মকৌশলের রূপায়ণে, প্রথমেই চালু থাকা নাগরিক সনদগুলিকে সংশোধন করে সেগুলি যাতে দশটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বজায় রাখতে সক্ষম হয় সেটা দেখতে হবে। দ্বিতীয়টি, প্রতিটি নাগরিক সনদকে সুশৃঙ্খলভাবে সহমতের ভিত্তিতে রচনা করতে হবে, যাতে করে সেটি বাস্তবসম্মত হয় এবং জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার দরুন সেই সনদের প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

মনে রাখতে হবে, দায়সারা কোনও প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। এক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত উদ্যম নিয়ে এগোবার আগে তিনটি পূর্বশর্ত রয়েছে : অভ্যন্তর থেকেই প্রেরণা জাগাতে হবে, যার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই মিশনের আকারে প্রেরণা সঞ্চারিত করে কর্মীদের উন্নততর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে হবে। সাফল্যের চাবিকাঠি খোঁজার আগে বিদ্যমান সীমিত ক্ষমতা ও বাধাবিপত্তির প্রেক্ষিতেই বাস্তবোচিত মান ও সংকল্প স্থির করে দিতে হবে। প্রয়োজনে বাইরের বিশেষজ্ঞদের (ব্যক্তিবিশেষ অথবা নাগরিক সমাজভুক্ত) সাহায্য নিতে হবে, যাদের দলিল রচনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। জোর দিতে হবে দায়বদ্ধ ব্যবস্থার ওপর। বিশেষ করে অভিযোগ প্রতিকারের কাজে নিয়োজিত আধিকারিকদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। একই সঙ্গে সংস্থান রাখতে হবে নির্ভরযোগ্য ফিডব্যাক ব্যবস্থার, যাতে করে বিভাগীয় কাজকর্মে ধারাবাহিক উন্নতি ঘটে। একটি অঙ্গীকারবদ্ধ দফতর থাকলে নতুন করে আর পরিষেবা ডেলিভারি বা অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিল বা আইনের প্রয়োজন পড়বে না। আগামী দুই বছরের মধ্যে ওই লক্ষ্যপূরণের জন্য চাই ঐকান্তিক প্রয়াস। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সমগ্র কর্মসূচিই পরিত্যাগ করা সংগত হবে।

ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা ঃ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

আশিসবরণ সামন্ত
পর্ব ২

মাত্র তেরো বছর এই কলেজে অধ্যাপনা করার পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কাজের পরিবেশ বিস্তৃত হতে থাকে। প্রায় নয় বছর পরে ১৯৯৪ সালে আরও বড় দায়িত্ব তাঁর ওপর প্রদত্ত হয়। অধ্যাপক ড. মিহির চৌধুরি কামিল্যা হলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার করার আহ্বান আসতে শুরু করে। নিজে একগুচ্ছ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার নিয়োগপত্র আলমারিতে ফাইল বন্দি করে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বজনগ্রাহ্যতা ও জনপ্রিয়তার এ এক বিশেষ নিদর্শন।

ইতিমধ্যে নানান সাফ্যল্যের পালক তাঁর মুকুটে গাঁথা হয়ে গেছে। ১৯৭৭ সালে ড. বিজিতকুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে ‘কবি নরহরি চক্রবর্তী’কে নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি পান। ২০০৩ সালে ‘রাঢ়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে দেবদেবী’ বিষয়ে গবেষণাপত্র জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। নিজে ১০টি পি.এইচ.ডির পরীক্ষক ছিলেন।

নিজে একের পর এক ডিগ্রি লাভ করে চললেও শিক্ষার্থীদের ডিগ্রিলাভে সহায়তা করতে বিমুখ হননি। প্রায় ৩০ জন গবেষক তাঁর তত্ত্বাবধানে পি.এইচ.ডি. করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অধ্যাপনার সাথে সাথে চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য সাধনা। শৈশবের দিনগুলিতে মায়ের প্রেরণায় ছড়া, কবিতা, পড়ার পাশাপাশি গড়ে ওঠে লেখার অভ্যাসও। মাত্র নয় বছর বয়সেই তিনি কবিতা লিখেছেন। তারপর নিজের হাতে লিখে নিজেই ভালো করে মলাট দিয়েছিলেন যা আজও অক্ষত। ১৯৫৭ সালে ‘শুকতারা’তে তাঁর প্রথম ছড়া প্রকাশিত হয়। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়েই তো তিনি লিখেছিলেন—

‘মা গো করো মোরে দয়া শুধু
কবি যেন মা গো হতে পারি।’

বিশ্বজননীই হোন বা মিহির জননীই হন তিনি মা-ই। আর মায়ের কাছে প্রার্থনা বিফলে যায় না। মা শান্তিবালা দেবী এক সময় বলেছিলেন—‘একশো বই লিখিস বাবা। শিশু, বৃদ্ধ সবার হাতে যেন থাকে তোর বই।’ তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কম বেশি পঞ্চাশ হবে। একশো পূর্ণ হয়নি। কিন্তু হয়েছে। শৈশব থেকে লিখে সযত্নে নিজেই বাঁধিয়ে রাখা বইগুলির সংখ্যা ধরলে। যাতে আছে কবিতা, ছড়া, কিছু ইংরেজি কবিতার অনুবাদ-তার সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি ফুলকুশমা গ্রামে তাঁর ব্যক্তিগত আলমারি থেকে এরূপ পঞ্চাশটি'র মতো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। যা মুদ্রিত না হয়েও গ্রন্থের সংখ্যা একশো পূর্ণ হতে সাহায্য করেছে, মায়ের মনস্কামনাও পূর্ণ হয়েছে। তবে, এতসব লিখলেও ১৯৯০ সালে প্রথমে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা ‘বাবা একটা রাজ সাপ মেরেছিল’ বিভিন্ন মহলে বেশ একটা সাড়া ফেলেছিল।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির একটি বর্ষ-ভিত্তিক তালিকা তৈরি করলে-বিশাল বিচিত্র সৃষ্টির প্রামান্য তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ঃ

১। রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা—ভোলানাথ প্রকাশনী—১৯৯২, ২। রাঢ়ের গ্রাম দেবতা— বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়— ২০০১, ৩। আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি--বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—২০০১, ৪। বাঁকুড়ার উপভাষা—হরজিৎ মিশন, কলকাতা-৯--২০০৩, ৫। বাংলা নারী সংস্কৃতি—পুনশ্চ, কলকাতা— ২০০৩, ৬। রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি--বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—২০০৬, ৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি ঃ স্বাদে আস্বাদে--ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০৭, ৮। লোকসংস্কৃতির দিগ্বলয়--ঢাকা, বাংলাদেশ--২০০৯, ৯। বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি ঃ একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা--বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—২০০৯।

প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য গবেষণা ঃ

১। নির্বাচিত চর্যাপদ—শিলালিপি—১৯৯৬, ২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত--শিলালিপি--১৯৯৭, ৩। বিপ্রদাসের মনসা বিজয় ঃ পুনর্বিচার--মণ্ডল বুক হাউস—২০০০, ৪। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ—মণ্ডল বুক হাউস—২০০১, ৫। নরহরি চক্রবর্তী ঃ জীবনী ও রচনাবলী (অখণ্ড)--বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়--২০০৮, ৬। নির্বাচিত চৈতন্যচরিতামৃত--মণ্ডল বুক হাউস—২০০৯

বিবিধ ১। পল্লি কবিতা ঃ ভোলানাথ মোহান্ত'র কবিকৃতি, খোলাকথা প্রকাশনী--১৯৭২ , ২। বাংলার সাহিত্যলোক (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস) দীপালী বুক হাউস--১৯৭৮, ৩। বাংলা সেতু সাহিত্য--সন্দীপ--১৯৯৮, ৪। বিহারীলালের সারদামঙ্গল ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ—২০০৩, ৫। বাংলা ছন্দ ঃ রূপ ও রীতি (১৫শ সং)—সন্দীপ—২০০৭, ৬। বাংলা অলংকার ঃ রূপ ও স্বরূপ (১১শ সং)—সন্দীপ—২০০৭, ৭। সাহিত্যের রূপ ও রীতি—মণ্ডল বুক হাউস—২০০৭, ৮। ভাষাতত্ত্ব ঃ বাংলা ভাষার ইতিহাস—মণ্ডল বুক হাউস—২০০৮।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারের ছবিগুলো

কলকাতার আরো একটা গর্ব ছিল নিউ থিয়েটার্স। এই নিউ থিয়েটার্সে বহু বাংলা ছবির শুটিং হয়েছে। এই থিয়েটার্সের কর্ণধার ছিলেন স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনিই নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে বহু ছবির পরিচালনা করেছেন। সেইসব কালজয়ী বাংলা ছবি আজ শুধুই নামে রয়েছে। বহু ছবির প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। বা তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তবে সেদিন এইসব বাংলা ছবি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে ও বঙ্গবাসীকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়ে গেছে। স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের অবদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৭০ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দিয়ে সম্মান দিয়েছিল। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে সেদিন বহু বাংলা ছবি হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে – পল্লীসমাজ, ভাগ্যচক্র, মায়া, সাপুড়ে, উদয়ের পথে, প্রতিবাদ, রূপকথা, নবীন যাত্রা, নদ ও নদী, চন্ডীদাস, দেবদাস দিদি, দেশের মাটি, রামের সুমতি, মন্ত্রমুগ্ধা, পরিত্রাণ, বনহংসী, মীরাবাঈ, গৃহদাহ, বিদ্যাপতি, পরিচয়, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহাপ্রস্থানের পথে, বকুল প্রভৃতি বেশকিছু ছবি। যখন দেখি, সত্যিই মনটা ভরে যায়। ইতিহাস তার সংরক্ষণের খাতায় যত্ন করেই রেখে দিয়েছে এইসব ছবিগুলি। তাই কত সহজে জেনে নিতে পারলাম। এখানে নিউ থিয়েটার্সের কথা আসতেই মনে পড়ে যায়, কে এল সায়গল সাহেবের কথা, পাহাড়ি স্যান্নালের কথা, কাজী নজরুল ইসলামের কথা, কৃষ্ণ চন্দ্র দে-এর কথা, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া সাহেবের কথা। এঁনারা ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের মাসিক মাহিনার শিল্পী। এই ব্যানার থেকে অন্য ব্যানারে যাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। এই সব শিল্পীদের নিউ থিয়েটার্স পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে একটা মস্ত বড় ভূমিকা পালন করে গেছে। এই কারণেই এখানে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এখানে এলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। ঠিক যেমনভাবে নিউ থিয়েটার্সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কৃষ্ণা অধিকারী
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়